দীপাবলি একটি সর্বভারতীয় উৎসব। যার উদ্দেশ্য আলোর রোশনাইয়ে অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটানো। এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হল আতসবাজি। তবে বর্তমানে যে হারে বিশ্ব উষ্ণায়ণ বাড়ছে, তার জন্য আমরা প্রত্যেকেই দায়ী। তাই আসুন, দূষণকারী আতস বাজির বদলে স্নিগ্ধ ও শীতল এল. ই. ডি. আলোর বন্যায় এবার আমরা নিজেদের জীবনকে আলোকিত করে তুলি। এই ক্ষুদ্র প্রয়াস হয়তো আগামী দিনে বিশ্বের অন্তত কিছু নিম্নভূমিকে জলমগ্ন হওয়ার থেকে বাঁচাতেও পারবে...

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৩, সংখ্যা ৬

নভেম্বের ২০২১

আলোকোৎসব সংখ্যা

কলম হাতে

ডাঃ অমিত চৌধুরী, ডঃ মালা মুখার্জী, রঞ্জিত মল্লিক, আবদুস সালাম, সমীর দাস, রিয়া মিত্র, অনির্বাণ বিশ্বাস এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

গুঞ্জন শুধুমাত্র গল্প-কবিতা উপস্থাপনের ক্ষেত্র নয়। আমরা এই পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের পথ, অজানা তথ্য, বিজ্ঞান, বিনোদন, ভ্রমণ বিবরণ লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশিত করি। তাই বলা যায়, ‘গুঞ্জন’-এর ব্যাপ্তি বহুমুখী। ‘গুঞ্জন’-এর এই নভেম্বর সংখ্যাটি ‘আলোকোৎসব সংখ্যা।’ দীপের আলোয় ভরিয়ে তুলুন সকল আশার প্রাসাদ। আর দূরীভূত করুন দূষণের করাল ধোঁয়াশাকে।

কারণ গোটা বিশ্বে জলবায়ুর অস্বাভাবিক পরিবর্তনের ফলে আমরা এক জ্বলন্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। কিছু দিন আগে এই বিশ্ব উষ্ণায়নের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তাবড় রাষ্ট্র নেতা ও নেত্রীরা গ্লাসগোয় COP 26 সম্মেলনে অঙ্গীকারবদ্ধ হন যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কার্বন নির্গমন বন্ধ করে, পানীয় জলের উৎস থেকে শুরু করে, মানুষের সাশ্রয়ী বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। তার সাথে পুনঃনবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। অর্থাৎ প্রাচীন যুগের মতো পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন গড়ে তোলা আবশ্যক। এই কাজে আমাদেরও এগিয়ে আসতে হবে এবং লেখনির মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে সচেতন করে তুলতে হবে।

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন
বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন
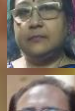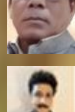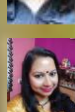
পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য আর একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে 'অরণ্যমন'এর স্টল থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

কলকাতার অন্যান্য বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে...

কলম হাতে

অনিবার্য কারণ বশত দীপঙ্কর সরকার-এর ধারাবিহিক কাহিনীটি এবারে প্রকাশ করা সম্ভব হোলনা।

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ গোধূলী ক্ষণে ক্লান্ত...

শিল্পীঃ সোহম মন্ডল ✧ বয়সঃ ১৮ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান চিত্রগ্রাহকের ছবিটি কেমন লাগল...

কাকের ছোঁ-এ বাজি উধাও

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

ছোট বেলায় আমাদের মামার বাড়িতে খুব ঘটা করে করুণাময়ী মা কালীর পুজো হত। কালীপূজার পর প্রতিপদ ছেড়েই সেখানে হত ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান। কাজেই প্রায় একটি সপ্তাহ ধরে চলত আমাদের সব মামাতো, মাসতোত ভাই-বোনেদের ধামাল।

আমার মা-রা ছিলেন ছয় বোন আর চার ভাই। মামার বাড়ির পুজোতে যে এত আনন্দ হত, তার প্রধান কারণ বোধহয় এটাই যে মায়েরা সব ভাইবোন যেমন ঐ পুজোতে একত্রিত হতেন, তেমন আমরা সব 'কাজিন'-রাও। সৌভাগ্যবশত, আমরা এবং আমাদের সব মাসীরাও কলকাতার আশেপাশে থাকলেও বছরের ওই ক'টা দিনই আমরা সবাই একসাথে মিলতে মিশতে পারতাম। বাকী সময়ে কখনই তেমন হত না।

আজ ভাবলে অবাক লাগে, কত রকম গল্পই না হত আমাদের মধ্যে ঐ কয়েকদিনের অবকাশে। আবার খুনশুটিও কম ছিলনা। মেজমামা প্রায় চার-পাঁচটা বড় প্যাকেট করে বাজি কিনে আনতেন, দু'দিন আগে। সেই বাজি সাজিয়ে ছাদে রোদে দেওয়ার ভার থাকত আমাদের বড় তিন ভাইবোনের ওপর। সব বাজি ভাগ হবার আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ কালীপূজার

দিন দুপুর পর্যন্ত, আমরা বারে বারে গুনতাম দোদমা বা চকলেট বম্বের প্যাকেট ছাদ থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে না তো?

এই বাজি উধাও হওয়ার ঘটনাটা নিয়ে আমরা রীতিমত উদ্বিগ্ন থাকতাম। আর ঘটনাটা ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যেত আমাদের ছোটমাসী এসে গেলে। হরিণঘাটা থেকে ছোটমাসী সাধারণত পুজোর দিন সকালেই আসতেন। উনি খুব আমাদের সাথে পাল্লা দিয়ে মিশে যেতে পারতেন। মনে হত যেন আমাদের আর একটা 'কাজিন' এসে পড়ল।

আমরা নীচের উঠোনে গল্পে বা কুমীর-ডাঙ্গা খেলায় মেতে গেলেই, কখনও কখনও খবর এসে যেত যে ছাদ থেকে কাকে বাজি তুলে নিয়ে পালাচ্ছে। বড় দুই দিদি তখন মুখ টিপে হাসত। আমি ছুটতাম কাক তাড়াতে। কিন্তু কাকের যা নেবার সে তো তখন তা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। অবশ্য বেশ কিছু ডিটেক্টিভ বই পড়া থাকায়, একে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, এখানে ওখানে 'সার্চ অপারেশন' চালিয়ে আমি প্রায়ই সেই কাকের গোপন ডেরা থেকে আবার বাজিগুলো উদ্ধার করে আনতাম। যেবার পারতাম না, সেবার সন্ধ্যায় আবার কাক সেই বাজিগুলো ছোটমাসীর হাত দিয়ে আমাকে পৌঁছে দিত, কাজেই সবার অজান্তে আমার বরাদ্দ বেড়েই যেত।

গত বছর কালীপুজোর ক'দিন আগেই ছোট মাসী চলে গেলেন না-ফেরার দেশে। আবার আসছে কালীপূজার দিনটা, তাই মাকে বলি – মা যেমন ছোঁ মেরে আমার মিষ্টি মাসীটাকে নিয়ে গেছো, যেখানেই রাখো, তাঁকে ভাল রেখো... ■

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

পঞ্চম পর্যায় (৩)

আমাদের লক্ষ্য সূর্যকুণ্ড, যেটা কিনা তিন কিলোমিটার দূরে। আজ ২২শে ফেব্রুয়ারী সকাল প্রায় আটটা নাগাদ এলাম সূর্যকুণ্ডে। কিন্তু এটাতো তিন কিলোমিটার দূরত্ব নয়! প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার। সূর্যকুণ্ড ঘাটের আগে পরশুরাম কুণ্ড। মাতৃহন্তা জমদগ্নী পুত্র পরশুরাম এখানেও কিছুদিন তপস্যা করেছিলেন। সুন্দর বাঁধানো ঘাট স্নানের উপযুক্ত জায়গা আছে। তাই তার সদ্ ব্যবহার করলাম। এই জায়গাটি নাকি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের বিধায়ক কেন্দ্র। স্নান এবং আরতি করে এগিয়ে গেলাম। সূর্যকুণ্ডের জলও মাথায় নিলাম। রাস্তার কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। দুটো ছেলে আমাদের বলল, “মহারাজ এই রাস্তা ছেড়ে মাঠের রাস্তা ধরুন,” তাই করলাম। দু-ধারে গম আর ভূট্টার ক্ষেত — তার মধ্যে দিয়ে আমরা পাঁচজন এগিয়ে চলেছি।

দুপুর সাড়ে বারোটার সময় ‘শকুরবাড়া’ নামের একটি গ্রাম পেলাম। চায়ের দোকান এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রও রয়েছে। সকাল থেকে একটু চাও পেটে পড়েনি, টিফিন তো দূরের কথা। আরও কত দূর যেতে হবে জানি না। কিন্তু

কাকাজী বিশ্রাম নিলেই রেগে যাচ্ছেন। কারণটা বোঝা যাচ্ছে না।

২২ নং জাতীয় সড়কের নর্মদা পরিক্রমার পথ ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। আশেপাশে যে কয়েকটি গ্রাম পড়ল, সেগুলি ভীষন নোংরা এবং মাছির উপদ্রব। দুপুর দু'টো নাগাদ আমরা গ্রামের পথ ছেড়ে আবার মাঠের পথ ধরলাম। চাষের জমি, খুব ভালো চাষ হয় এদিকটায়। দূর থেকে একটি বিশাল প্রাচীন বটগাছ দেখতে পেলাম। তার নীচে একটি পাঞ্জাবী সাধু বসে আছেন। কিছুটা কাছে যেতে দেখলাম, কুঁড়েঘর থেকে একটি লোক এসে আমাদের কিছুক্ষণ বসে যেতে বলল। আমরা সেখানে বসে পড়লাম। ঠাণ্ডা জল দিয়ে ওরা আপ্যায়ন করল। সঞ্জয় বার বার বলে চলেছে, "মা কি আজ আমাদের জন্য একটু ভাত জোটাবেন না?"

সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। এখন প্রায় তিনটে বাজে। এখনো আমরা ভালো করে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পাইনি। হঠাৎ দেখি মাঠের দিক থেকে দুজন স্থুলকায় প্রৌঢ় 'পরিক্রমাবাসী এসেছেন', শুনে ছুটতে ছুটতে আসছেন। একজনের সবিনয় অনুরোধ কাল তাঁর মেয়ের বিয়ে তাই আমাদের উপস্থিত থেকে বিবাহ উৎসবটি সুসম্পন্ন করতে হবে। আর এখন তাঁর বাড়িতে আমাদের দুপুরের ভোজন প্রসাদ গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় অনুরোধটি আমরা রাখার তাগিদ অনুভব করলাম। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মেয়েটিকে আশীর্বাদ করে ওঁদের বুঝিয়ে দিয়ে আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

নমামি দেবী নর্মদে

বিকাল চারটে পনেরো মিনিট। কিছুদূর যাওয়ার পর মাইকে নর্মদার ভজন শুনতে পেলাম। শিবরাত্রি আগত প্রায়। তাই হয়তো এই নর্মদা মায়ের পূজো হচ্ছে। আমরা এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ পিছন থেকে একটি লম্বা যুবা পুরুষ আমাদের নর্মদার প্রসাদ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। যতই সময় নষ্ট হোক এই অনুরোধ প্রত্যাখান করা সম্ভব নয়। বিকাল পাঁচটার সময় আমরা একটি বিশাল নদীর সেতুর উপর এসে পড়লাম। নদীটির নাম তাওয়া। নদীর তরে প্রচুর চাষ হচ্ছে দেখতে পেলাম। দেড় কিলোমিটার দূরে এই তাওয়া নদী নর্মদার সাথে মিলিত হয়েছে। গ্রামটির নাম বাঁদরভান।

রামায়ণে রাম রাবণের যুদ্ধের সময় যে সব বাঁদরেরা রামের পক্ষ নিয়ে রাবণ বধে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের ব্রহ্ম হত্যার পাপ লাগে। বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র রাবণ একজন তান্ত্রিক। তাই ব্রহ্ম হত্যা পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বাঁদর সেনারা এই জায়গাটিকে তপস্যার জন্য বেছে নেন।

এক পরিক্রমাবাসী একটি ভালো কথা শোনালেন, নর্মদার তটে যাঁরা আসেন তাঁরা সবাই পাপ মুক্তির জন্য আসেন। সেটা আগেও হতে পারে পরেও হতে পারে। কিন্তু আসতে তাঁদের হবেই। আমরাও এসে পড়লাম সঙ্গমস্থলে একটি নর্মদা মন্দিরে। সন্ধে হয়ে গেছে। বিশ্রাম নিয়ে আরতি করে শুয়ে পড়লাম। চলার আর শক্তি নেই। আজকের হিসাবে তেত্রিশ কিলোমিটারের বেশি পথ হেঁটেছি।

নর্মদে হর।

...ক্রমশ ■
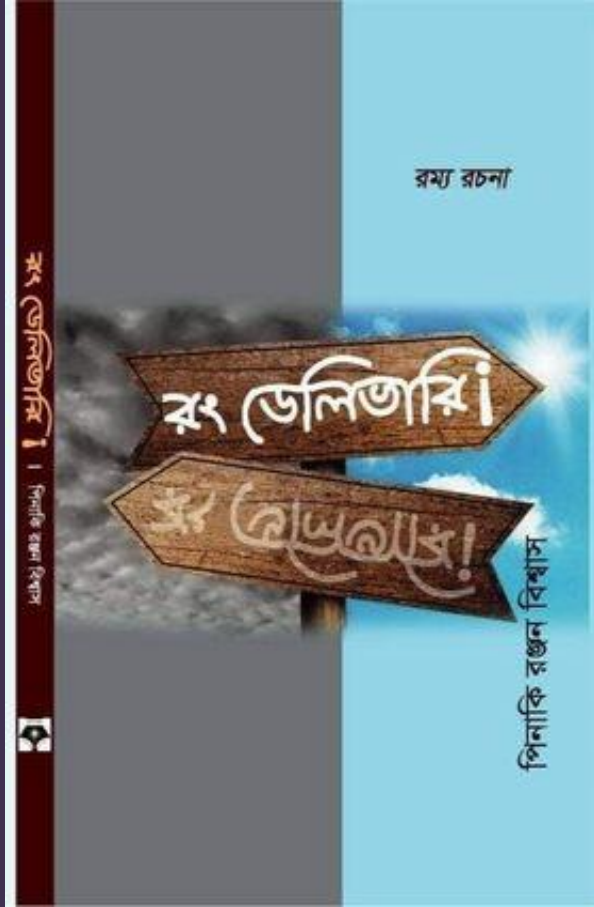
আলোর উৎসব

গোবিন্দ মোদক

দীপাবলি হলো আলোর উৎসব পাঁচদিন ধরে চলে,
নানান রঙে কত না আলো বাড়ি-লোকালয়ে জ্বলে।
শরতকালের কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীতে ধনতেরাস আসে,
তখন থেকেই আলোর উৎসবে দেশবাসীরা ভাসে।
প্রদীপ, বাতি, মোমের আলো, আতসবাজি কতো,
নানা রঙের কতো না আলো জ্বলে যে শত শত।
বাংলা-আসাম-ওড়িশা-মিথিলাতে তখন কালীপূজা,
লোলজিহ্বা .. ভয়ংকরী .. খড়্গধারিণী .. চতুর্ভূজা।
দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন — আলোয় ফেরে দেশ,
"তমসো মা জ্যোতির্গময়" — অন্ধকার হয় শেষ।
চৌদ্দ প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে আলোকের আহ্বান,
আকাশ, বাতাস, বসুন্ধরার আলোক সুধায় স্নান।
ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মরিশাস, মায়ানমার,
মালয়েশিয়া বা সিঙ্গাপুর কত যে ব্যাপ্তি তার!
শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি এলেই আলোর উৎসব শেষ,
তবুও তো দেশজুড়ে তার — রেখে সে যায় রেশ।। ■

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’-তো অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: ডিসেম্বর ২০২১ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই নভেম্বর, ২০২১

নাড়কান্ডায় কান্ড

সমীর দাস

হিমাচলে কিন্নর দেশে যাওয়ার ইচ্ছা বহুদিনের। এবার বেরিয়েই পড়লাম, প্রথমে যাব কল্পা। দিল্লী থেকে বেরোলাম দুপুর দু'টো নাগাদ। এক দৌড়ে যাওয়া যেত, ১৮-১৯ ঘন্টার রাস্তা, কিন্তু পাহাড়ি রাস্তার কথা ভেবে ঠিক করলাম সিমলার আশেপাশে কোথাও এক রাত্রি কাটাব।

সিমলা শহরে না ঢুকে কুফরি-ফাগুর দিকে গিয়ে হোটেল খুঁজছিলাম। কিন্তু অদ্ভুত ব্যপার, রাস্তার উপর কোন খোলা হোটেল পেলাম না। এগোতে এগোতে নাড়কান্ডায় পৌঁছে গিয়েছি। অনেক রাত তখন, সেখানেও সব বন্ধ। ভাবলাম রাস্তায় গাড়িতেই কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। তখনই হাঁটু হোটেলের কথা মনে পড়ল, আসার পথে সেখানেই বুকিং আছে। পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি নিয়ে সেখানে গেলাম। গেট খোলা ছিল, কিন্তু হোটেলের দরজা বন্ধ। ডাকাডাকিতেও কারো সাড়া পেলাম না। অগত্যা গাড়ির ভিতরেই ঘুমের চেষ্টা। ঘুম আসছিল না, তার উপর প্রচণ্ড ঠান্ডা। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, মোবাইলের টর্চের আলো ভরসা মাত্র। বেশি এদিক ওদিক যাওয়াও বিপজ্জনক, কেননা চারিদিকে পাহাড়ের ঢাল।

বিপত্তি

আকাশের দিকে নজর যায়। তারায় তারায় ভরা সে এক অপূর্ব দৃশ্য, বহুদিন এমন তারকা খচিত আকাশ নজরে আসেনি। একটু চেষ্টা করে সপ্তর্ষিমন্ডল ও দেখতে পেলাম মনে হল। হঠাৎ দেখি কেউ একজন এদিকেই আসছে। আমাদের দেখে বেশ অবাক। সব কথা বলতে, অভয় দিয়ে কোন দিকে চলে গেল বুঝলাম না। কথাবার্তায় এখানকার কর্মচারী বলেই মনে হয়েছিল।

ভোরের দিকে কখন চোখ লেগে গিয়েছিল জানি না। অ্যালার্ম-এর আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলেই হতবাক অবস্থা। এ কোথায় শুয়ে ছিলাম! এ তো বাসস্ট্যান্ড-এর পাশে সেই জায়গা, যেখান থেকে পাহাড়ের উপর হাঁটু হোটেলে গিয়েছিলাম। একটু দূরে সেই হোটেলের রাস্তার দিগ্-দর্শক বোর্ড ও নজরে পড়ল। ওই রাস্তা দিয়েই তো কাল রাতে উপরে গিয়েছিলাম। নীচে কখন এলাম? ড্রাইভার তো এখনো ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাচ্ছে।

বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল আশঙ্কায়। ড্রাইভারকে উঠালাম, সেও কিছুক্ষণ পর ব্যাপারটা বুঝে দেখি ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে, মুখে গুরুর নাম। তারপর সেই অবস্থাতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছুটিয়ে পরের শহরে গিয়ে থামা। সেখানে গিয়ে চা-টা খেয়ে কিছুটা ধাতস্ত হলাম। তারপর অনেক ভেবেও ভুতুড়ে ব্যাপার ছাড়া এ ঘটনার কোন ব্যাখ্যা পেলাম না। কোন ক্ষতি হয়নি, তবুও ব্যাপারটা ভাবতেই বুকের

ভিতরে কাঁপুনি আসে। এদিকে দু'পাশের হিমালয় এখন অপরূপ। কিছুক্ষণ পড়েই সে দৃশ্যাবলী উপভোগে মন চলে গেল, তবুও ব্যাপারটা মাথা থেকে পুরোপুরি যাচ্ছিল না।

দুপুর নাগাদ কল্পা পৌঁছলাম। ভরদুপুর, তবুও নানাভাবে যাচাই করে, তবেই হোটেল-এ ঢুকলাম। সত্যি বলতে আজও কোন হোটেলে ঢোকার আগে খোঁজ খবর নিই আগে। ফেরার পথে, নাড়কান্ডায় ড্রাইভার কিছুতেই সেই হোটেলে যেতে চাইছিল না। দিনের বেলা, তাই আমারও গোঁ ধরে গেছিল, হাঁটু হোটেলেই গেলাম সেই রাস্তাতে। দিনের বেলায়, এটি রাতে যাওয়া সেই রাস্তা কি না চিনতে পারছিলাম না। কিন্তু হোটেলে পৌঁছে নিশ্চিত হলাম এ হোটেল সে রাতের হোটেল নয়।

অতিথিতে ভরা হোটেল, বুকিং ছিল, তবুও নিশ্চিত হয়েই ঘর নিলাম। কোন অস্বাভিকতা নজরে আসেনি। নানা ভাবে খোঁজ নিলাম, আশেপাশে পুরানো নতুন কোন হোটেলই নেই, না ছিল কোন কালে। রাতে ঘুমোতে পারিনি, সজাগ ছিলাম। সাবধানের মার নেই। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে দেখছিলাম। না! কিছু কিছু তারা থাকলেও, এ আকাশ সে রাতের আকাশ নয়। ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/
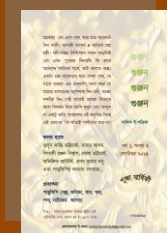
পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **‘গুঞ্জন’এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

সরমা পিসির গল্প

দোলা ভট্টাচার্য

সরমা পিসির জীবনের গল্পটা খুবই কষ্টের। যাকে ভালোবেসেছিলেন, তাকে বিয়ে করতে পারেননি। সরমা পিসি আমার আপন পিসি নয়। ওনার সাথে কেউ আমার পরিচয় করিয়ে দেয়নি কখনও। তবু পরিচয় হয়ে গেছে। আমার বাপেরবাড়ির পাড়াতেই থাকতেন উনি। ওনার মেয়ে শিবানি ছিল আমার সহপাঠী। আমার বিয়ের পর থেকেই সরমা পিসির সাথে আর যোগাযোগ ছিল না। আজ এতদিন পর সরমা পিসির সাথে এইভাবে দেখা হবে ভাবিনি কখনও।

আমার বাবার পুরোনো অ্যালবামে সরমা পিসির ছবি দেখেছিলাম একদিন। তখন নাইন কি টেন-এ পড়ি। মা বলেছিলেন, বাবার ছোটবেলার বন্ধু উনি। সেদিন আর কোনো প্রশ্ন জাগেনি আমার মনে। বাড়িতেও সরমা পিসিকে নিয়ে কোন আলোচনা শুনিনি কখনও। কিন্তু আলোচনা হতো আমার জেঠু কাকুদের বাড়িতে। শ্রেয়া, আমার খুড়তুতো বোন, একদিন আমায় বলল, একটা কথা শুনলাম জানিস, আর শুনে আশ্চর্য লাগল খুব। বললাম, “কি শুনেছিস?”

“এই, মেজ জেঠুমণি নাকি প্রেম করত ও পাড়ার সরমা

পিসির সঙ্গে, খুব যেন গোপন কথা বলছে, এমনভাবে কথাগুলো বলল শ্রেয়া।” বললাম, “কোথা থেকে শুনলি তুই!”

“আরে! কাল মা, বড় জেঠিমণি আর ছোট পিসিমণি আলোচনা করছিল। বাবার সাথে সরমা পিসির কি সম্পর্ক ছিল আমি কিছুই জানিনা না।”

শ্রেয়া বলল, “দূর, ওরা মিথ্যে বলবে নাকি। সম্পর্ক নিশ্চয় কিছু ছিল।” বললাম, “থাকতেই পারে। যেমন তোর আছে রজতের সাথে। কিন্তু রজতের সাথে তোর বিয়ে নাও হতে পারে। সহসা চুপ করে গেল শ্রেয়া।” বুঝলাম, ওর খুব দুর্বল একটা জায়গায় আঘাত করে ফেলেছি। ঘটনাটা সম্পূর্ণ জেনেছিলাম, আমার মায়ের শ্রাদ্ধবাসরে। সেদিন আমার বড়জেঠিমণি সবার সামনে বলেছিলেন, সরমার অভিশাপ লেগেছে। যে সংসারটা সরমার হতে পারতো, সেই সংসার হল রীণার। তাইতো ওকে অকালে চলে যেতে হল। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। শোকের পরিস্থিতি খানিকটা থিতিয়ে এলে, বাবাকেই জিজ্ঞেস করলাম, “মায়ের শ্রাদ্ধের দিনে বড় জেঠিমণি এমন কেন বলল?” কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বাবা বলল, “আমি আর সরমা, একে অপরকে খুব ভালোবাসতাম। আমরা ঠিক করেছিলাম, বিয়ে করব। আমি তখন চাকরি পেয়েছি সবে। আর সরমা কলেজে পড়ত। আমাদের মেলামেশার কথা দুই বাড়ির সবাই একসময়ে জানতে পারল। দুই বাড়ি থেকেই উঠল প্রবল

আপত্তি। কারণ, সেই পুরোনো বর্ণভেদ। আমরা ব্রাহ্মণ আর ওরা বৈশ্য।

সরমাকে জোর করে অন্য একজনের সাথে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল। ওর বিয়ের আগের দিন শেষ বারের মতো একবার দেখা করেছিলাম আমরা, গোপনে। কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সরমা। বলেছিল, গৌতম দা, এ জীবনে না হলেও, মরণে আমাদের মিল ঠিক হবেই দেখো। বিয়ের চার বছর পর শাঁখা সিঁদুর ঘুচিয়ে, একমাত্র শিশুসন্তানকে নিয়ে সরমা এখানে ফিরে এসেছিল। শুরু হয়েছিল যন্ত্রণাময় জীবন-যাপন। একই পাড়ায় বাস করলেও, আমরা কিন্তু কেউ কারও সাথে যোগাযোগ রাখিনি। তোর মাকে আমি কোনোদিন অসম্মান করিনি। তবে আমাদের বৌভাতের দিন এই সমস্ত কথা তোর বড়জেঠিমণি তোর মাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।” জিজ্ঞেস করলাম, “মায়ের রিঅ্যাকশন কিরকম ছিল?”

বাবা বলল, “কিরকম আর হবে। তবে আমি তোর মাকে কথা দিয়েছিলাম, কোনদিন কষ্ট দেব না তাকে। আর সেও যেন আমাকে কখনো অবিশ্বাস না করে। আমি কথা রেখেছিলাম। তোর মাও আমাকে কখনো অবিশ্বাস করেনি।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, “মাকে ভালোবাসতে পেরেছিলে বাবা?” বাবা চুপ করে রইল, উত্তর দেওয়ার আর দরকার ছিল না। এটাই স্বাভাবিক। একটা কথা খুব মনে হচ্ছিল,

সংযোগ

ভাবছিলাম, একটা মানুষের ওপর কতটা আক্রোশ থাকলে, তবে তার শ্রাদ্ধবাসরে এমন কথা বলা যায়!

ঘাটের সিঁড়িতে একাই বসে আছি চুপ করে। মনটা অতীতে চলে যাচ্ছে বারবার। প্রায় দশ বছর আগে চলে গেছে মা। আজ বাবাও চলে গেল আমাকে ছেড়ে। বাপের বাড়ি বলতে আমার কিছু রইল না আর। আজ দুপুর দু'টো নাগাদ ম্যাসিভ অ্যাটাক হয় বাবার। খবর পেয়েই চলে আসি আমি। হাসপাতালে নিতে নিতেই সব শেষ। তারপর থেকেই যন্ত্রের মতো ঘুরে যাচ্ছি। এখান থেকে ওখান, ওখান থেকে সেখান। সবশেষে এই শ্মশান। আমি যেহেতু বাবার একমাত্র মেয়ে, বাবার শেষ কাজটাও আমাকেই করতে হবে। জেঠুমণি, আর কাকুমণি, দুজনেই চেয়েছিল বাবার মুখাগ্নি করতে। আমি দিইনি। বাবা অসুস্থ অবস্থায় পড়ে ছিল কতদিন। কেউ দেখতে অবধি আসেনি বাবাকে। এমনকি, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়েও পাড়ার ছেলেরাই সাহায্য করেছে। শ্মশানবন্ধুও ওরাই। বিমান, আমার স্বামী। সেও তো দিল্লিতে। খবর দিয়েছি ওকে। জানিয়েছে আজই ফিরছে। ছেলেটাকে শাশুড়ির কাছে রেখে আমি একাই এসেছি।

এখানে ইলেকট্রিক চুল্লী নেই। কাঠেই শবদাহ করা হয় এখনও। শ্মশানেও কোনো আলো নেই। শ্মশানে ঢোকার মুখটায় রাস্তার ওপর শুধুমাত্র একটা লাইট পোস্ট রয়েছে।

সংযোগ

এই আলোকিত অঞ্চলটা পেরোলেই অন্ধকারের রাজত্ব। তাই ভয়ই লাগছিল একটু।

এই প্রথম আমার শ্মশান দর্শন। মায়ের সময় বাবাই এসব কাজ করেছিল। মুখাগ্নির পর বাবার শরীরটা যখন সম্পূর্ণ অগ্নিগ্রাসে চলে গেল, নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। ভেঙে পড়লাম কান্নায়। সেই মুহূর্তে যে আমার পাশে এসে দাঁড়াল, সে বিমান। ওখান থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে এল ঘাটে। বিকেলের ফ্লাইট ধরেই চলে এসেছে ও। সেই থেকেই বসে আছি এখানে। ঘড়িটা দেখলাম, সাড়ে ন'টা বাজে। এখনও সময় লাগবে কিছু। বিমান এখন উঠে গিয়ে বসেছে পাড়ার ছেলেগুলোর কাছে। একলা হতেই মনটা হু হু করে উঠল আবার। চোখের জল বাঁধ মানছে না। হঠাৎ অনুভব করলাম, কেউ যেন আমার পিঠে আদরের হাত বোলাচ্ছে। অবাক হয়ে তাকালাম, "ওমা! কে ইনি! কখন এসে বসলেন এখানে!" শুক্লপক্ষ চলছে। দুদিন পরেই পূর্ণিমা। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দেখতে পেলাম, সরমা পিসিকে, বসে রয়েছেন আমার পাশে। বাতাসে উড়ছে পিসির দুধসাদা শাড়ির আঁচল। "ওমা! সরমা পিসি! তুমি! কখন এলে?"

"এই তো, একটু আগে। কানে শোনার পর আর থাকতে পারলাম না। চলে এলাম।"

"ও মা, এত কাঁদিস না রে। এখানে বসে অমন কাঁদতে নেই। অমঙ্গল হয়। কাঁদিস না আর। কি করবি বল? মানুষ

তো মরবেই। সময় হলে তাকে যেতেই হবে। এই তো বিধির নিয়ম রে মা।” সরমা পিসির কাঁধে মাথা রেখে বসে ছিলাম অনেকক্ষণ। কি সুন্দর মা মা গন্ধ সরমা পিসির গায়ে। এই গন্ধটা অনেকদিন পাইনি। ডুবে ছিলাম গন্ধটার মধ্যে। দূর থেকে শুনতে পেলাম বিমান ডাকছে, “রিয়া, হয়ে গেছে। চলে এসো এখানে।” সরমা পিসিকে বললাম, “চলো, ওরা ডাকছে।”

পিসি বলল, “এসব কাজ আমি দেখতে পারি না বাপু। তুই যা দেখি। আমি আর একটু বসি এখানে।”

গোল ঘরটার মধ্যে তখন আর একটা চিতা জ্বলে উঠেছে। ঘরটার বাইরে প্রবেশ পথের কাছে আর একটা ডেডবডি লাইনে রয়েছে। জ্বলন্ত চিতাগ্নির আভা পড়েছে মৃত মানুষটির মুখে। বাবার অস্থিটুকু নিয়ে বেরোবার সময়ে চোখ পড়ল সেদিকে। চমকে উঠলাম। এ কাকে দেখছি আমি! এই মানুষটিই তো ঘাটে আমার পাশে বসেছিল। এই মানুষটির গায়ের মা মা গন্ধের মধ্যেই তো এতক্ষণ ডুবেছিলাম আমি। আর একটু এগিয়ে খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর। জীবনে হয়নি, তাই মরণেই মিল হল ওঁদের। এইভাবেই বুঝি কথার দাম দিতে হয়! আমার চোখ থেকে ঝরে পড়া জল ভিজিয়ে দিচ্ছিল সরমা পিসির কপাল। মনে মনে বললাম, ভালো থেকো পিসি। ভালো থেকো তোমরা। ■

দ্বন্দ্ব

ছায়া যুদ্ধ

আবদুস সালাম

বার্ধক্যের আঙিনায় অলীক পর্দা ওড়ে
ছায়া পড়ে দিনান্তের আঙিনায়
বিষন্ন ক্লান্তিরা হেঁটে যায়
ছায়া মাপি আয়ুর দরজায়।

ভালোবাসারা বাসর সাজায় সঙ্কটময় মোরগডাঙায়
ছায়া যুদ্ধ চলে, সংকটের নৌকা ভাসে স্নিগ্ধ জলে
মানবিক স্কুল সব বন্ধ,
আত্মসমর্পণ ডানামেলে উড়ছে।

হাঁসপাখিরা ডানায় মাখে প্রত্যয়
সুদূর সাইবেরিয়ায় ফেলে আসে তার অনবদ্য ইতিহাস
ঘন্টা বাজে মন্দিরে মন্দিরে।

নেমে আসে বার্ধ্যক্যের অন্ধকার
ক্রিকেট বলের মতো মার খায় সপাটে
অস্তিত্বের বাঁশি বাজে দ্রোহ হীন উপাচারে,
গল্প হয় ছক্কাচারের
প্রহর শেষে আম্পায়ার তুলে নেয় স্টিকবেল
বিধ্বস্ত ছায়ার গ্যালারিতে দর্শক উল্লাসে মাতে
কেউ বোঝেনা কারো হাসি-অভিমান
কান্না হয়ে ঝরে পড়ে পৃথিবীর প্রত্যয়। ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

শূণ্যতা

অনির্বাণ বিশ্বাস

জানি পাড়ি দিয়েছ অনেক দূরে
হয়তো বা ভুলে গেছো পুরোনো জীর্ণ স্মৃতি।
ভুলে যেতে হয় বা ভুলে গেলেই হয়তো-বা মেলে মুক্তি!
নাহলে পুরোনো এ শহরে ঘুরে মরে কি-ই বা পাবে?
পরিচিত ছিলো যারা আজ আর তারা কেউই নয় তোমার,
কিংবা তুমিই হয়তো এখন শুধুই ফ্রেমে বাঁধানো দেওয়ালের
একটুকরো অতীত!
নিভে যাওয়া তারার মতো নিভে গেছো তুমিও চিরতরে।
ভাঙা প্যাণ্ডেল বা বিসর্জনের মূর্তির কি-ই বা মূল্য এ পৃথিবীতে?
ভাঁটার গভীর টানে আজ তুমি ভেসে চলেছ
মহাসিন্ধুর পরপারে।
ঘাটের দিকে দৃষ্টিতে কি-ইবা লাভ?
সে তো ঝাপসা হতে হতে মিলিয়ে যাবেই চিরতরে।
আপনের স্মৃতিপটেও পড়বে সময়ের ধুলো আর তাতেও
আজ না হোক ভবিষ্যৎ বুনবে নূতনত্ব
মাকড়সার জালেরই মতো।
জাগতিক বাস্তবতাকে কার সাধ্য করে উপেক্ষা?

ব্যাপ্তি

যদি পরজন্ম বলে কিছু থেকে থাকে
তাতেই নূতন কুঁড়ি হয়ে ফুটে
জগতকে ভরিয়ে দিও তোমার কর্মের সুগন্ধে
আবারও নতুন করে বেঁচো - পুরোনো যাতনা ভুলে।
হও নবরূপকার ভবিষ্যতের
বেঁচো সত্যিকারের মানুষ হয়ে
থেকো মানুষের পাশে বন্ধু হয়ে
কোরো রচনা নবসৃষ্টির
মুছে দিয়ে মানুষের অশ্রু-শূণ্যতা
কোরো নবসৃষ্টির সূচনা-নবরূপে
সময়ের বুকে কেটো তারই আলপনা
আবারও --নব আবেশে।।

ভিসুভিয়াস

কবিরুল (রঞ্জিত মল্লিক)

“বাড়িতে ঢুকতে ভীষণ ভয় করছে রে। সবাই এতক্ষণে ঘটনাটা জেনে গেছে।”

“তা জানুক। তুই তো একটা যোগ্য জবাব দিতে পেরেছিস। সমাজ, পরিবারকে একটা ম্যাসেজ পাঠালি। যেটা আরো অনেক লড়াকু মেয়েকে অনুপ্রাণিত করবে। ওদের পরিবারে হাসি ফোটাবে।”

“দাদু শুনে খুব কষ্ট পাবেন। উনি চাননি আমি...”

“দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। মেজমণির কথাটা একবার ভাববি না?” দু’দিন পরেই গোধুলি থমথমে মুখে পাড়াতে ঢুকল। সবে সন্ধ্যে নেমেছে। আবছা আলোতে দেখতে পাচ্ছে দু’চারজন তার দিকে কেমন তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অনেকের বাঁকা মন্তব্য কানে আসছে।

“মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, বাড়ির বৌ, কোথায় গুছিয়ে সংসার করবি, তা না ফুটবল নিয়ে নেচে বেড়ান।”

“এখনকার বাড়ির বৌরা বড্ড বেপরোয়া। নিজের স্বামী, শ্বশুরদের চোখ রাঙানিকে অতটা পাত্তা দেয়না।”

“ঠিক বলেছেন। আমার বৌমাকে তো দেখছি...”

বাড়িতে পা ফেলতেই সে দেখল দাদু যমের মতন দাঁড়িয়ে

আছেন। গোধুলি ট্রফিটা রেখেই দাদুকে প্রণাম করল। "সব কিছু ঠিকমত হয়েছে তো? কোন অসুবিধা হয়নি?"

"না দাদু।"

"ওকে। এবারে একটু বিশ্রাম নাও। আর শোন, খেলার পাশাপাশি সংসারটাও মন দিয়ে করতে হবে।" দু'জনের কথাবার্তার মাঝে ছোটকামণি এসে পড়েছে। দাদুর চোখ ছলছল করছে। ছোটকামণির চোখ বেয়েও নামছে অতি ক্ষীণ কংসাবতীর শ্রাবণী পূর্ণিমার ভরা কোটাল।

ছোটকামণি গোধুলিকে মেজমণির ঘরে নিয়ে গেল। মেজমণি ট্রফিটা দেখেই লাফিয়ে উঠল,"আমি জানতাম তুই পারবি। এই খেলা নিয়ে সবুজের সাথে তোর কম অশান্তি হয়নি। আমিই ওকে সব বুঝিয়ে রাজি করিয়েছি।"

"ওভাবে বলছ কেন? তুমিও কম করোনি। আমার অনুপ্রেরণা! আজ তুমি না থাকলে..."

"না রে পাগলি! তুই সবটা জানিস না। পরে বলব।"

রবিবারের দুপুরবেলা। বাড়িতে সবাই একসাথে বসে খাচ্ছে। সবুজের মুখে উপচে পড়ছে খুশীর রোদ্দুর। বাড়ির বৌমা আজ ফুটবল ম্যাচে চাম্পিয়ান হয়েছে। সাথে উওম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট। টিভিতে, পেপারে ছবি বেড়িয়েছে। সকলেই তৃপ্ত।

মেজমণি গোধুলিকে বড় জ্যেঠিমণির ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটা বন্ধই থাকে। উনি মারা যাবার পর থেকে। চাবি দিয়ে

জয়ী

ঘরটা খুলতেই নিয়ন আলোতে ঝলমল করে উঠল ঘরটা। গোধুলি ট্রফিটা জ্যেঠিমণির ছবির সামনে রেখেই অঝোরে কেঁদে উঠল। ও সবটা শুনেছে। মেজমণি ওকে সব বলেছে।

একটা সময়ে জ্যেঠিমণি দাপিয়ে ফুটবল খেলত। বিয়ের পরও খেলেছে। শ্বশুড়বাড়িতে এই নিয়ে কম অশান্তি হয়নি। পরে সংসারের চাপে পড়ে খেলা ছেড়ে দিতে হয়। সেই থেকে যাবতীয় ফুটবলের সরঞ্জাম জার্সি, বুট জোড়া, ফুটবল, মেডেল, ট্রফি একটা ট্রাঙ্কে বন্দি রেখে নিজের বুকের খাঁচায় জ্বলে ওঠা "ভিসুভিয়াস" এর আগুনকে থিতিয়ে দিয়েছিল। চোখের জলের দু'ফোঁটা নোনা পানি সেই আগুনের আঁচেও পড়েছিল। তবে শেষ হয়ে যায়নি।

খেলা ছাড়লেও ফুটবলের প্রতি ভালবাসা ছেড়ে চলে যায় নি। সময় পেলেই নিয়ম করে টিভিতে ফুটবল ম্যাচ দেখত। তাও দরজা বন্ধ করে। মাঝে মাঝে লুকিয়ে বাপের বাড়ির যাবার নাম করে কলকাতার ময়দানে বড় ম্যাচ দেখে আসত। একবার ধরাও পড়েছিল শ্বশুড়ের চোখে। পরে এ বাড়ির আর এক বৌমা, মেজমণি ঝরণা নিজে ভাল স্ট্রাইকার হয়েও শ্বশুড়বাড়িতে এসে খেলা ছেড়ে দেয় সংসারের মায়ায় পড়ে। নিজের কষ্টগুলো, লড়াই করার অদম্য বাসনা, গোলের খিদে, জার্সি, বুটজোড়ার মতন ট্রাঙ্কবন্দি করে রেখেছিল। ঠিক বড়জা-এর পথ ধরেই... অলিন্দের ছোট্ট কুঠুরিতে টিম টিম করে জেগে থাকা

জয়ী

"ভিসুভিয়াস" মনে হল যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

বহু বছর পরে গোধুলি এই বাড়ির নাতবৌ হয়ে সব সমীকরণ ভাঙ্গল। ওর জেদ, দাপুটে চলাফেরা, হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম খুলে দিল ঝরণার মনের বন্ধ দরজা। ওর মধ্যে নিজেকে দেখতে পেল। বুকে হাত দিয়ে অনুভব করেছিল "ভিসুভিয়াস" আত্মার মতন ওর শরীর ছেড়ে গোধুলির শরীরে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে। খুব খুশী হয়েছিল সেদিন। শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে ওর দু' পায়ের শিল্প দেখেছিল। বুঝেছিল গোধুলি পারবে। সব অপমানের জবাব দিতে। অতি ক্ষুদ্র আগ্নেয়গিরির আঁচকে বাঁচিয়ে রেখেছিল তিল তিল করে গড়ে তোলা পায়ের জাদুতে।

সেদিনের মাঠের চিৎকার, জয়ধ্বনি, আবেগ একটু একটু করে খুলে দিচ্ছে বহু দিনের পুরানো জং ধরা বন্ধ ট্রাঙ্কটা। যেখান থেকে জমানো বেদনা, চাপা পড়া কান্না, পুরানো জার্সি পরে গলায় মেডেল ঝুলিয়ে কাপ হাতে বেরিয়ে আসছে। আর সকলের তিরষ্কারের জবাব দিচ্ছে চেঁচিয়ে, "এই দ্যাখো, আমি পেরেছি। তোদের শত বঞ্চনা আমাকে থামাতে পারেনি। বরঞ্চ উৎসাহ জুগিয়েছে।"

গোধুলির সোনালী ট্রফিটাই শুষে নিচ্ছে বন্ধ ঘরের সব অন্ধকার। ট্রফির স্বর্ণালী আভা একটু একটু করে মরচে ধরা ট্রাঙ্কের উপর বাটিক প্রিন্টের জ্যামিতি আঁকছে। "ভিসুভিয়াস' এর লাভা যেন গলে গলে পড়ছে।

জয়ী

বহু দিনের পুরানো শুকিয়ে যাওয়া রজনীগন্ধার মালাতে, ধুলোর চাদরে অযত্নে লালিত বড় জ্যেঠিমণি জয়ারাণী ফটো ফ্রেমের আড়াল থেকে যেন শুনতে পাচ্ছেন গোধুলির সেই হাড় হিম করা ম্যাচের চিৎকার। তার হর্ষ ধ্বনি — "বলটা বাড়াস। ডিফেন্সটা বড় আলগা হয়ে যাচ্ছে... মাঝ-মাঠটা একটু দেখে খেলিস... ঐ দিকটা ফাঁকা হয়ে গেল... গোধুলি! গোধুলি... গোওওওওওওওল..." ■

✗ এরা আমার সহকর্মী আমি তাদের সাথে মাস্ক ছাড়াই কথা বলতে পারি।

✗ এরা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাদের সাথে মাস্ক ব্যবহার ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়োজন নেই।

✗ উনারা আমার আত্মীয়, তাদের সাথে মাস্ক ছাড়াই মেলামেশা করা যায়।

উপরের তিনটি ভুল করা থেকে বিরত থাকুন এবং সঠিক ভাবে মাস্ক পরুন, নিজে বাঁচুন ও সমাজকে রক্ষা করুণ।
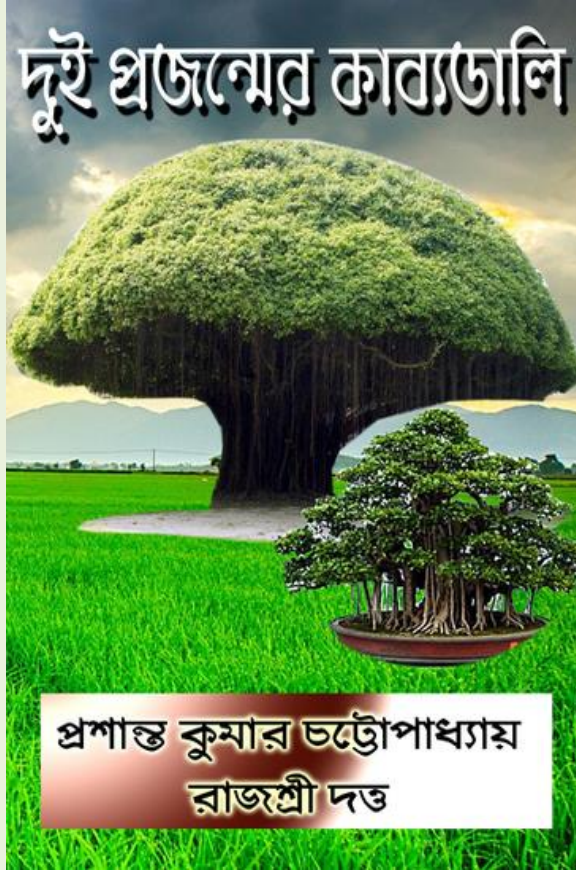
দীপদান

ডঃ মালা মুখার্জী

"ওরে তোরা শুনছিস," ষাট বছরের প্রৌঢ়া মহারাণী অন্দরমহলে হাঁক পাড়লেন, "সে ফিরছে রে, সে ফিরছে। তোরা আজ দীপের মালায় আলোকিত করবি প্রাসাদের প্রতিটা বারান্দা, একটি কোণাতেও যেন অন্ধকার না থাকে। তোদের যুবরাজ আজ ফিরছেন..."

রাণীর গলায় খুশী যেন আর ধরে না। তিনি যতটা তাড়াতাড়ি পারেন ছুটে চললেন পুত্রবধূর মহলে। সেই হতভাগিনী আজ বারো বছর প্রাসাদে দীপ জ্বালায়নি, প্রতিজ্ঞা করেছিল, স্বামী না ফিরলে আলো জ্বালাবে না, দেখবে না কারোর মুখ। আজ অন্তত সেই হতভাগিনী নিশ্চয় দীপ জ্বালাবে।

দাসদাসীরা সসব্যস্ত হয়ে সরে গেল। যে বন্ধ কপাট কোনো এক অভিশপ্ত রাতে বন্ধ হয়েছিল, তা রাণীমার এত বছরের চেষ্টাতেও খুললো কই? বৃদ্ধ পিতার অনুরোধ, দুগ্ধপোষ্য শিশুর কান্না, কোনো কিছুই তার পাষাণীহৃদয় গলাতে পারল কই ?

রাণীমা দোরে করাঘাত করলেন, "যশো, মা আমার, দরজাটা খোল," ওপার থেকে কোনো উত্তর এলো না।

"মন্ত্রী উদীয়ান সংবাদ এনেছেন, তিনি রাজগৃহে আছেন। মহারাজের অনুরোধে কার্তিক অমাবস্যায় ফিরবেন। এবার তো দরজা খোল মা...."

স্বর্ণনির্মিত দরজাটি ভিতর হতে খুলে গেল। রাজকুমারী যশোধরার সর্বক্ষণের দাসী বেরিয়ে এল, "হে মহাপ্রজাপতি, রাজকুমারী জানতে চান যুবরাজের আগমন সম্বন্ধে।"

মহাপ্রজাপতি গৌতমী এক প্রকার ছুটে এলেন ঘরে। বাইরের কক্ষের আলো যেটুকু পড়ল সেই অন্ধকার কক্ষে তাতে তিনি দেখলেন রেশমের দুগ্ধফেননিভ রাজশয্যা খালি, মাটিতে চাদর বিছিয়ে এক কৃশকায় নারী বসে আছেন, উন্মুক্ত কেশদাম তার পিঠ আচ্ছাদিত করে রেখেছে, আর পরণে চীবর।

"যশোধরা!" গৌতমী ককিয়ে উঠলেন। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী এই যশোধরাকে তো তিনি চেনেন না। আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে যে সোনার পুত্তলিকে পুত্রবধূ করে এনেছিলেন, সে ছিল রজকন্যা যশোধরা। এ তো পরম যোগিনী!

"এসো মা," যশোধরা সম্বোধন করলেন।

"তিনি যদি এই হতভাগনীকে মনে রাখেন, যদি তিনি দেখা করেন তবে আমিও তাঁকে জিজ্ঞেস করবো কোন সত্যের সন্ধানে তিনি তরুণী ভার্য্যা আর দুগ্ধপোষ্য শিশুকে রেখে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন? কার দুঃখ মোচনের জন্য তিনি ঘরের লোকের দুঃখ উপেক্ষা করলেন?" যশোধরা

কান্নাভেজা গলায় বললেন।

"তাই করিস মা," গৌতমী বললেন, "আমি তোকে কথা দিচ্ছি আমি তাকে তোর কাছে আনবোই আনবো।" বলে সোনার চিরুনী হাতে নিয়ে দাসীকে বললেন সুগন্ধী তেল আনতে। যশোধরাকে আবার তিনি সোনার প্রতিমা বানাবেন।

"জানিস তো মা, সিদ্ধার্থের আগমনে কাল কার্ত্তিক অমাবস্যায় দীপদান উৎসব হবে কপিলাবস্তুতে। সে আসছে, সঙ্গে পঞ্চাশজন শিষ্য।" গৌতমী মানসচক্ষে পুত্র সিদ্ধার্থকে কল্পনা করলেন।

সেই কোন শিশুকালে জ্যেষ্ঠা ভগিনী মহামায়া স্বর্গে গেছেন, তারপর থেকে কোলেপিঠে করে বোনের ছেলেটিকে মানুষ করেছেন, মহারাজ শুদ্ধোধনের অন্তঃপুরের সব দায়িত্বও একা হাতে সামলেছেন, তাই ছোটো থেকে একটা ভয় ছিল ছেলেকে নিয়ে। রাজজ্যোতিষি মহারাজকে বলেছিলেন, "কুমার সিদ্ধার্থ একদিন সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন, তাই দুঃখ-কষ্টের কোনো দৃশ্য যেন তাঁর চোখে না পড়ে।" রাণী গৌতমীই তো অন্তঃপুরটি একদম সিদ্ধার্থের মনোমত করে গড়েছিলেন, শৈশবে সবরকম খেলনা আর যৌবনে রাজকুমারোচিত সকল উপকরণ দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিলেন সিদ্ধার্থকে, না, না, এ যুগের বুদ্ধকে। সিদ্ধার্থের বাকি সব খেলনার মতোই এনেছিলেন যশোধরাকে, পুত্রের যৌবনের খেলনা হিসেবে; কিন্তু গৌতমী কিভাবে ভুলে গেলেন যে

যশোধরা কোনো খেলনা নয়, এক রক্তমাংসের মানুষ। ছেলের কুষ্ঠিতে সন্ন্যাসযোগ দেখেও কেন মেয়েটিকে বউ করে আনলেন তিনি? গৌতমী নিজেকে ধিক্কার দিলেন, পরক্ষণেই ভাবলেন, "না, না, ঠিকই করেছিলেন, নয়তো পৌত্র রাহুলের মুখও দেখা হতো না। সেই দেবশিশুটিই কপিলাবস্তুর ভবিষ্যত, যদিও সেই হতভাগ্য বালক পিতাকে মনেও করতে পারে না, আর মাতা অর্ধোন্মাদিনী।"

"দাসী প্রদীপ নিয়ে এস," মহারাণীর কথা মতো দাসীরা প্রদীপ নিয়ে এলো। মুহূর্তে সেই অন্ধকার কক্ষ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল হাজার দীপের আলোয়। গৌতমী হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, প্রদীপের রোশনিতে যশোধরার কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। দাসী ফিসফিসিয়ে বলল, "রাজকুমারী কেঁদে কেঁদে..."

"থাক," গৌতমী দাসীকে থামতে বললেন। তিনি যা বোঝার বুঝে গেছেন, আর এর উত্তর সিদ্ধার্থ মানে ভগবান বুদ্ধকে দিতে হবেই হবে। বুকে পাথর চাপা দিয়ে গৌতমী পাকশালে এলেন।

রাজ অন্তঃপুরের মতো পাকশালাটিও মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অবাধ বিচরণক্ষেত্র, তবে, আজ প্রায় এক যুগ পরে বানালেন সিদ্ধার্থের প্রিয় মিষ্টান্ন, পলান্ন, পরমান্ন আর বহুবিধ শাকসব্জি। তাঁর কাজ শেষ হতে না হতেই নগরদ্বারে বাদ্য বেজে উঠল। দাসী খবর দিল, "ভগবান বুদ্ধ রাজদ্বারে

এসেছেন, তবে তিনি রাজবাটিতে প্রবেশ করবেন না।”

গৌতমী বললেন, “রাজ উদ্যানেই আমি বুদ্ধ ও অনুগামীদের জন্য খাদ্য নিয়ে আসছি...” গৌতমী ভাবলেন, তাঁকে হারলে চলবে না।

গৌতমী বহুদিন পরে রাজ্ঞীবেশ পরলেন, দাসীদের আদেশ দিলেন সোনার পাত্রে খাদ্য ও সুশীতল জল নিয়ে তাঁর সাথে রাজোদ্যানে আসতে, যেখানে বুদ্ধ তাঁর বাণী দিচ্ছেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থও বহুদিন পর তাঁর পিতামাতাকে দেখলেন, কিন্তু তিনি জানেন এঁরা তাঁর নশ্বরদেহের পিতামাতা, এই স্থূলদেহেরও ওপরে আছে এক পরম আধ্যাত্মজগত – যাকে জানতে হলে মানতে হবে পঞ্চশীল, চলতে হবে সত্যের পথে অষ্টাঙ্গিকমার্গ ধরে; এ পথ রাজকার্য্যের চেয়েও কঠিন। পিতাকে এতক্ষণ ধরে এসবই বোঝাচ্ছিলেন।

এমনই সময় হঠাৎ সামনে এলেন মাতা, তিনি খাবার এনেছেন। আগেও যেমন বিভিন্ন সুস্বাদু ভোজন দিয়ে আপ্যায়ন করতেন, আজও নিশ্চয়ই তাই করবেন। কিন্তু মাতার বুদ্ধসমীপে এমন সম্রাজ্ঞীবেশ কেন? আর ওঁর পাশে অবগুণ্ঠনবতী এক নারীকে দাসী ধরে ধরে আনছেন কেন?

বুদ্ধ হাসলেন, “হে মহাপ্রজাপতি গৌতমী, সোনার পাত্রে কেন পরমান্ন এনেছেন? আমাদের ভিক্ষুকদের জন্য বরাদ্দ

মৃৎপাত্র,” বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষাপাত্র দেখালেন, তাতে এক টুকরো পোড়া আলু, “পথে এক মাতা ভিক্ষা দিয়েছিলেন।”

গৌতমীর চোখে জল এলেও তিনি বললেন, “হে তথাগত, আপনার এই ভিক্ষুক জীবনের মহানতা এক নারী কিভাবে জানতে পারবে? নারী তো গৃহবন্দী। সঙ্ঘে কি তার স্থান হবে?”

“অসম্ভব দেবী,” বুদ্ধ বললেন, “গার্হস্থ্য নারীর ধর্ম, কৃচ্ছ্রসাধন তার পথ নয়।”

“তাই নাকি?” গৌতমী বললেন, “আমি এমন এক নারীকে জানি যিনি বারো বছর এক ভিক্ষুকের চেয়েও কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন।”

“কে তিনি? এমন নারী অবশ্যই বোধিলাভের যোগ্যা। তাঁকে সামনে আনুন, মাতা...”

সেই অবগুণ্ঠনবতী নারী ধীর পায়ে এগিয়ে এসে বুদ্ধের চরণ কমল স্পর্শ করতেই এক ঝলক হাওয়ায় তার মস্তকাবরণ খসে গেল। অগুনিত দীপের আলোয় উদ্ভাসিত হলো এক পরিচিত মুখ, যশোধরা! সেই নারী তাঁর হরিণীর ন্যায় নয়নযুগল দিয়ে শেষবারের মতো পতিদেবতাকে দেখবার বিফল চেষ্টা করলেন। বুদ্ধ বুঝলেন দীর্ঘ বারো বছর ধরে ক্রমাগত রোদনে নয়নদীপ নিভে গেছে যশোধরার, শত সহস্র প্রদীপের আলোও আর যশোধরার চোখের আলো ফেরাতে পারবে না।

বুদ্ধ ধীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, “নারীও বোধিলাভের যোগ্যা, বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘে আজ থেকে নর-নারী উভয়ই স্বাগত...”

গৌতমী হাসলেন, হাসলেন যশোধরাও। মানসচক্ষে যশোধরা দেখলেন নগরের শতসহস্র প্রদীপ কার্ত্তিক অমাবস্যার নিগূঢ় অন্ধকারকে ভেদ করে জ্বালিয়ে তুলছে জ্ঞানের অপার্থিব আলো, আজ কপিলাবস্তুর দীপদান উৎসব সত্যিই সার্থক।

(তথ্যসূত্র : গোতমী সুত্তো ও মহাভাস্তুর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে এই ঐতিহাসিক কল্পকাহিনীটি) ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

মূল্যঃ ৮০ টাকা [অনলাইনে কুরিওর শুল্ক অতিরিক্ত]

অ্যামাজন লিঙ্কঃ

https://www.amazon.in/gp/offer-listing/8194223695/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=new

এখন কলেজ স্ট্রীটেও পাওয়া যাচ্ছে।

ঠিকানাঃ আদি নাথ ব্রাদার্স, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা – ৭০০০৭৩ ● দূরভাষঃ +৯১ ৩৩ ২২৪১ ৯১৮৩

বৃষ্টির ছোঁয়া

রিয়া মিত্র

একদৌড়ে রাস্তা থেকে বাসস্ট্যান্ডের শেডের তলায় এসে দাঁড়াল শর্মিলি। ঠিক সময়েই ঝমঝম্ করে বৃষ্টিটা নেমেছে, পুরো ভিজে গেল ঠিকই কিন্তু একটা সুবিধা হলো, চোখ দিয়ে যে অঝোর ধারায় জল পড়ছে, সেটা কারও চোখে পড়বে না। অবশ্য আশেপাশে সেরকম কেউ নেইও। শুধু একজন ছেলে বাইকটাকে স্ট্যান্ড করে তাড়াতাড়ি শেডের তলায় চলে এল। শর্মিলির কোনোদিকেই মন নেই, চোখটা ওর ঝাপসা হয়ে আসছে ক্ষণেক্ষণেই। এই মুহূর্তে কী করবে, কোথায় যাবে, ঠিক বুঝতে পারছেনা সে! অনুজের হাত ধরেই তো বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু তার পরিণাম যে এতটা ভয়ঙ্কর হবে, তা ভাবতেই পারেনি সে।

পূর্বপরিকল্পনা মতো বাড়ি থেকে লুকিয়ে এক কাপড়ে বেরিয়ে এসেছিল সে। অনুজ প্ল্যাটফর্মে ওর জন্য অপেক্ষাই করছিল। ঠিক ছিল, দূরপাল্লার ট্রেনে চড়ে দুজনেই এখান থেকে অনেকটা দূরে চলে যাবে। সেইমতো চেপে বসেছিল ট্রেনে কিন্তু ঘটনার মোড়টা হঠাৎই অন্যদিকে ঘুরে গেল। একটা ফোন আসতেই অনুজ শর্মিলিকে বসিয়ে কথা বলতে দরজার সামনে উঠে গেল। বেশ কিছুক্ষণ অনুজ ফিরছে না

দেখে শর্মিলি উঠে দরজার কাছে গেল। দরজার সামনে বাইরের দিকে তাকিয়ে অনুজ ফোনে কথা বলায় ব্যস্ত থাকায় ওর উপস্থিতিটা টের পায়নি। শর্মিলি ওকে ডাকতে যায় কিন্তু তার আগেই ওর কথা শুনে হোঁচট খায়, পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যায় ওর।

ফোন ধরে অনুজ তখন বলে চলেছে, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ ভালো দাম পাবেন শর্মিলির। আমার কাজ আমি করে দিয়েছি, এবার ওকে বোম্বে পাচার করার দায়িত্ব আপনার আর আমার পার্সেন্টেজের কথাটাও মাথায় রাখবেন কিন্তু।” অনুজ ওকে দেখার আগেই তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসে পড়ে বিহ্বল শর্মিলি! অনুজ ফিরে এলেও কিছু আর বলতে পারেনা ও। শেষে সিদ্ধান্ত নেয়, যা হওয়ার হবে, বাবা-মায়ের কাছে ফিরে তো সে যেতে পারবেই না। কিন্তু এর হাত থেকে বাঁচার জন্য তাকে একবার শেষ চেষ্টা করতেই হবে। অবশেষে অনুজ ঘুমিয়ে পড়লে এই অজানা স্টেশনেই সে নেমে পড়ে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাসস্ট্যান্ড অবধি আসতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টিটা নেমে গেল।

দূরের ছোট টিলাপাহাড়টার মাথায় ঘনকালো মেঘ জমেছে। বর্ষা এসে গেছে, ভারতবর্ষের প্রথম বর্ষা কেরালার এই কালপেট্টা গ্রামেই আগে প্রবেশ করে। পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মেঘটা এদিকে আসতে গিয়ে ঝমঝম্ করে ভাসিয়েই দিল চারপাশটা। নদীর কালোজলে বৃষ্টির

ফোঁটাগুলো পড়তেই মাছগুলো লাফিয়ে উঠতে লাগল, কয়েকটা মাছরাঙা জলের মধ্যে ডুব দিয়ে মাছগুলো মুখে নিয়েই উড়ে গেল আকাশের কালো মেঘের দিকে। নদীর ধারের গাছগুলোর সবুজ পাতাগুলোর শরীর বেয়ে বৃষ্টির জল চুইয়ে পড়ছে নদীর জলে, ধীরেধীরে কাজলকালো মেঘের সম্ভারে টইটম্বুর হয়ে উঠতে থাকে চারিদিকটা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে একমনে বর্ষারাণীর মনভোলানো রূপ দেখছিল শর্মিলি। কৌশিকের ডাকে চমক ভাঙল, "দ্যাখো তো, কফিটা কেমন বানালাম?"

শর্মিলি কফিতে এক চুমুক দিয়ে হেসে বলল, "দাআরুউণণ।"

কৌশিক ওর কপালে একটা চুম্বন করে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

শর্মিলি ওর বুকে মাথা রেখে বলল, "সেদিন যদি তুমি না থাকতে, তাহলে জানিনা আমার কী হতো!"

কৌশিক ওকে জড়িয়ে ধরে ওর চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, "বাসস্ট্যান্ডে তোমাকে প্রথম দেখেই ভালোবেসে ফেলেছিলাম, ঐ যাকে বলে, লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। তারপর যখন তোমাকে কাঁদতে দেখে এগিয়ে গিয়ে কথা বললাম, তখন তো চোখের জল মুছতে মুছতে তুমি সবটাই বললে আমাকে। সেদিনই চাকরিতে জয়েন করার জন্য কেরালা আসব আমি, তোমাকেও সঙ্গে আনার সিদ্ধান্ত নিলাম, তুমিও বিশ্বাস করে আমার হাত ধরলে আর তারপর

এখন আমাদের চার বছরের সংসার হয়ে গেল।” শর্মিলি ওর বুকের মধ্যেই মুখটা গুঁজে বলল, “জীবন সত্যিই খুব সুন্দর, কৌশিক।” বাইরের তুমুল বৃষ্টির ছাঁট তখন ভিজিয়ে দিচ্ছে দুটো শরীরকে... ■

‘গুঞ্জন’এর ২০২১ এর অন্তিম সংখ্যার বিষয়বস্তু

ডিসেম্বর – অণু সংখ্যা

নভেম্বর সংখ্যাটি প্রকাশে বিলম্ব ঘটায়, ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ঐ সংখ্যায় লেখা পাঠানোর তারিখ বর্ধিত করা হোল।

নিজের মাস্কটা ঠিক করে পড়ুন
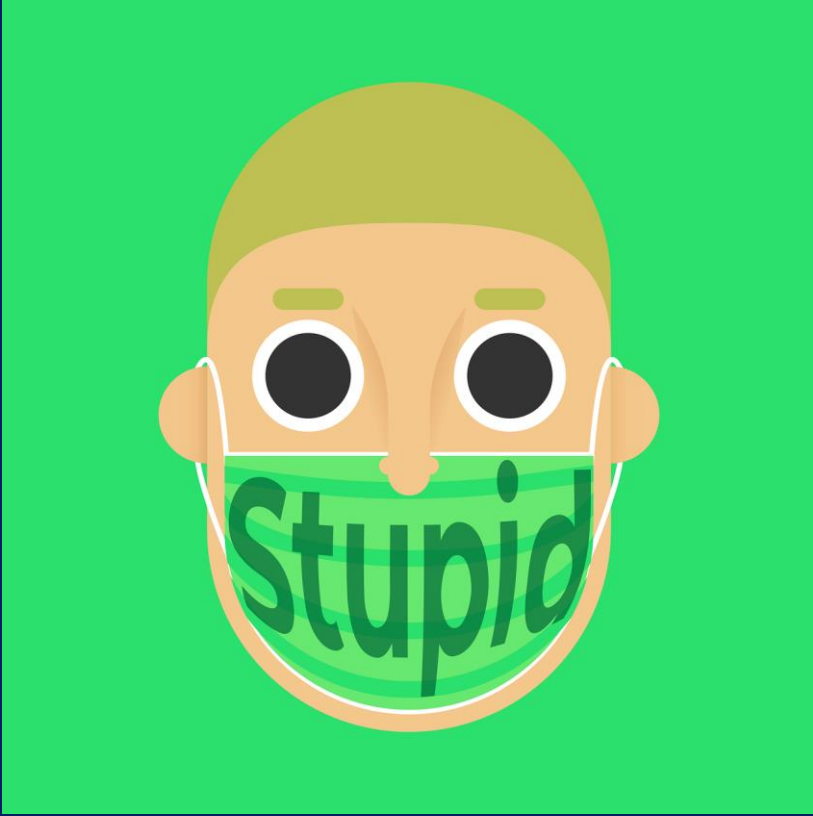
মাস্ক পড়াটা কোন ফ্যাশন নয়, এটা অত্যন্ত জরুরি

নিয়মিত হাত ধোয়া এবং স্যানিটাইজারের ব্যবহার আপনাকে সুরক্ষিত রাখে।

নিজে সুস্থ থাকুন, সবাইকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করুন।